OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 385 - 393
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকে মানবিক অস্তিত্ব ও সমাজবাস্তবতা : ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গভঙ্গ’, ‘উজানে মৃত্যু’

সবুজ মিয়া
গবেষক
প্রভাষক (বাংলা)
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস, হিউম্যানিটিস এন্ড সোস্যাল সাইন্স
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID: sobujahmed01791@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Syed Waliullah, Bahipir, Tarangabhanga, Ujane Mrityu, Dramatic Literature, Existential Crisis, Humanism, Socialism, Religious Fundamentalism, Modern Consciousness.

Abstract
Syed Waliullah (1922–1971) occupies an important and distinctive position in the history of Bangla dramatic literature. His plays profoundly portray human existential crises, social inequality, contemporary social structures, religious orthodoxy, conflicts of power, and the individual's aspiration for an independent self. The playwright's humanistic perspective is particularly reflected in Bahipir, Tarangabhanga, and Ujane Mrityu. This research paper explores the nature and distinctive features of Waliullah's dramatic art through an analysis of the themes, characters, conflicts, and dramatic techniques employed in these three plays. In Bahipir, the playwright exposes religious hypocrisy, superstition, the abuse of social power, and human helplessness. In contrast to the imposition of authority in the name of religion, the play highlights individual humanity, conscience, and the assertion of women's freedom. Tarangabhanga focuses on human inner conflicts, tensions in relationships, conflicts between desire and reality, and changing perceptions of life. On the other hand, Ujane Mrityu gives particular significance to human struggle against adversity, the struggle for survival, the conflict between human beings and fate, and existential crisis. Across the three plays, conflicts between desire and reality, the individual and society, belief and reason, and life and death are expressed in various dimensions. Waliullah's plays are not merely representations of the social realities of a particular period; rather, they engage with the perennial crises, aspirations, and questions of human existence. The primary objective of this research is to explore the distinctiveness of Syed Waliullah's dramatic creation, his humanistic philosophy, and his modern consciousness of life as reflected in Bahipir, Tarangabhanga, and Ujane Mrityu.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী ষোলশহরে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। মাত্র আটবছর বয়সে তিনি মাতা হারা হন। ফলে একটি প্রচ্ছন্ন অভাববোধ, মায়ের আকস্মিক মৃত্যুজনিত নৈঃসঙ্গানুভূতি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাল্য ও কৈশোরে মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সান্নিধ্য লাভে মামার থেকেই সাহিত্য প্রেরণা জেগে ওঠে।

সরকারি পদস্থ কর্মকর্তার সন্তান হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্বদেশের কোনো নির্দিষ্ট মৃত্তিকা মর্মমূলে শিকড়ায়িত হতে পারেনি এবং বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীকে আজন্ম আপন ও চেনা ভাবতে পারেনি। স্বদেশ ও পূর্ববাংলার অখণ্ড ভূগোলকেই তিনি নিজের বলে ভেবেছেন এবং সব মানুষের প্রতিই বোধ করেছেন প্রগাঢ় আকর্ষণ ও হৃদয়ের অনুরাগ। স্বভাষী ও স্বদেশে বাস করেও অন্যদের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণ পিতার কর্ম-পরিচয়। সহপাঠী বালকদের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি ফলে তিনি হয়ে পড়েছেন আত্মমগ্ন, বিবিক্ত স্বভাবী ও গ্রন্থবদ্ধ।

ইংরেজি দৈনিক 'দি স্টেটসম্যান'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে শুরু করেন কর্মজীবন। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ হওয়ার পরপরই 'স্টেটসম্যান'-এর চাকরি ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন এবং রেডিও পাকিস্তানের সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। 'মাসিক মোহাম্মদী', 'মাসিক সওগাত', 'পূর্বাশা', 'অরণি', 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ'-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্রমাগত বিভিন্ন গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর গল্পসংকলন *নয়নচারা* (১৯৪৫) পূর্বাশা প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। মামা সিরাজুল ইসলামের সহযোগে তিনি গড়ে তোলেন প্রকাশনা সংস্থা 'কমরেড পাবলিশার্স'। ১৯৪৮ সালে নিমতলির বাসাতে বসে *লালসালু* রচনায় হাত দেন। যে উপন্যাসে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে সমাজমূলের পীর প্রথার দিকটি প্রকাশ করলেন। সবকিছু পাবার পরও তার মধ্যে নৈঃসঙ্গচেতনা দেখা যায়। *লালসালু* নির্ধারিত কালসৃষ্ট হয়েও সার্বকালিক, বিশেষ হয়েও নির্বিশেষ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ করাচি কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক হয়ে ঢাকা ছাড়েন ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান সরকারের দূতাবাস হয়ে নয়াদিল্লি, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, ফ্রান্সের প্যারিসে, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থান করেছেন। সিডনিতে অবস্থানকালে ফ্রান্সের দূতাবাসী আন্-মারি তিবোর সাথে পরিচয় হয় যা পরিণয়ে রূপ পেয়েছিল। বিয়ের সময় তিবো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় আজিজা মোসাম্মদ নাসরিন।

মানুষ মাত্রই প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে রাজনীতি-শাসিত ও সমকাল দ্বারা প্রভাবিত। সমকাল তাঁর চেতনাকে আলোচিত করেছে। বিশ শতককে তিনি 'ক্রান্তিকাল' বলে ভেবেছেন। তিনি নিজের অনুভূতিলোকে কখনো বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রশ্রয় দেননি। কালের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই তিনি মানুষকে নতুন ও প্রাণময় সৃষ্টিতে যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন ও সাহিত্য দর্শনে স্ববিরোধী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কসকে বিশ শতকের মুক্তিদূত ভাবলেও মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হননি। এক্ষেত্রে ডি. এইচ. লরেন্সকেই আদর্শ মনে করতেন। সমকালের আর্থ সামাজিক ঘটনাস্রোত তাঁর মনোগঠনে ছায়া ফেলেছে। কালের প্রতিকূল ও অনুকূল ঘটনাস্রোতে বাহিত হয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবতাবাদী শিল্প নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন।

লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্মম্ভর ছিলেন না। অন্যের গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, প্রয়োজনে নিজের রচনার পাঠ-পরিবর্তনেও কুণ্ঠিত হতেন না। সাহিত্য সম্পর্কে বলেন - 'সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা - সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা! আপনা থেকে যা বেরুবে তা-ই খাঁটি...।' (আবুল মকসুদ, ১৯৮১:৩৩৯) *চাঁদের অমাবস্যায়* (১৯৬৪) তিনি আরেফ আলীর অস্তিত্ব সংকট ও উত্তরণকে আর *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে (১৯৬৮) কুমোরডাঙার জনজীবনের আলেখ্য তুলে এনেছেন ওয়ালীউল্লাহ্।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চারটি নাটক - *বহিপীর* (১৯৬০), *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬২), *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৪), *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪) সবকটিই ষাটের দশকে প্রকাশিত। বহিপীর নাটকের জন্য পি.ই.এন পুরস্কার পান, লালসালুর জন্য ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন, ১৯৬৫ তে - দুই তীর ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।

মঞ্চসফল নাটকের জন্য তিনি বহুল প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর নাটকে অবক্ষয়িত গ্রামীণ সমাজ, পীর-ফকিরের স্বার্থসিদ্ধি, নব-যুগের কল্যাণকামী মানুষ, প্রচ্ছন্নভাবে যৌন-চেতনার ইঙ্গিতবাহী বিষয় প্রকাশ হতে দেখা যায়। ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃজনশীল মনের প্রেরণা বাংলার মাটি থেকেই উৎসারিত। সেই সাথে চিন্তার প্রসারতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কাজ করেছে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা।

মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর সমর্থন ছিল, কলকাতার মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে সাধ্যমতো অর্থ পাঠাতেন। কিন্তু স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়।

‘বহিপীর’ : বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১) একজন আধুনিকতাস্পর্শী, জীবনার্থঋদ্ধ নাট্যকার। তাঁর প্রথম নাটক *বহিপীর*। ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও এর রচনাকাল ১৯৫৫। পি.ই.এন ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতায় নাটকটি দ্বিতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়। প্রথম উপন্যাসের মতো প্রথম নাটকেও সমাজের কথা বলেছেন। বক্তব্য-প্রধান এই সামাজিক নাটকে বহিপীরের মুখ দিয়ে ‘নতুন জীবনের’ জয়ধ্বনি এবং ‘পুরাতন দুনিয়ার’ পরাজয় ঘোষণা করা হয়েছে। ‘এখানে মানবীয় আদর্শ ও হৃদয়বৃত্তির বিষয় অংকিত হয়েছে।’ (আবদুল হাই, আলী আহসান, ১৯৬৪: ৪৭৮) শিল্পী হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্‌ সমাজের বাহিরকে আশ্রয় করেন না। তাঁর রচনা সমাজের অন্তর সত্যকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করে থাকে। *বহিপীর* নাটকের তাহেরা, হাশেম আলীর পুনর্জাগরণ, শুদ্ধসত্তা ও মীমাংসিত চেতনায় উন্নীত হতে দেখা যায়। সমালোচকের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য—

> “বহিপীর নাটকের পটভূমিকা পল্লী-সমাজ হলেও আধুনিক নর-নারীর মনে যে আত্ম আবিষ্কারের দাবী আজ আমাদের সমাজে লেগেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। পীর মুর্শিদে ভক্তি আমাদের মজ্জাগত সংস্কার। কিন্তু মানবিক অধিকারের দাবিতে যে এ সংস্কারে শৈথিল্য এনেছে। তারই কিছুটা ছাপ আমরা এ নাটকে পাচ্ছি। শুধু মুরিদের অন্তরে নয় পীরও যে আজ জীবনধর্মে বিচলিত তাঁরও প্রথাগত জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে, তারও ইঙ্গিত পাই এখানে।” (নীলিমা, ১৯৭২: ৪৮১)

নাটকটি চরিত্রপ্রধান, ফলে চরিত্রের মনোভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয় ভাবনা উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মনে হয়। বহিপীর নাটকের ছয়টি চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর বিষয় ভাবনাকে নাটকে প্রোথিত করে দিয়েছেন। চরিত্রগুলোকে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে একটি সুস্থিত ও স্বস্তির অবস্থানে স্থাপন করে আধুনিক জীবনভাবনার প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর নাট্যভাবনায় প্রভাব বিস্তার করেছে পাশ্চাত্য জীবনবোধ। চরিত্রগুলোর মানবিক, আদর্শবান ও শুদ্ধ সত্তার উত্তরণ বিষয়ের ইতিবাচকতাকে প্রকাশ করে থাকে। *বহিপীর* নাটকটিতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে দেখা যায় - বিলুপ্তিপ্রায় জমিদার প্রথা, পীর ফকিরের প্রতি মানুষের অনাস্থা, মানবিক হৃদয়বৃত্তি ও নতুন জীবনের স্বীকৃতি।

> “সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ আমাদের পাঁচ দশকের এক বিরল, নিরীক্ষাপ্রিয় ও মৌলিক নাট্য-প্রতিভা; আর তাঁর *বহিপীর* বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার নাট্য-সাহিত্যে এক স্মরনীয় সংযোজন, ব্যতিক্রমধর্মী শিল্প— অভিজ্ঞান।” (জীনাত, ২০০১: ১৭০)

বহিপীর নাটকটির প্রধান চরিত্র বহিপীর। দেশের বিভিন্ন স্থানে তার মুরিদান রয়েছে। ফলে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাদের দীনের শিক্ষা দেয় সে। তাঁর নামের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> “আপনি লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কী করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়। আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৩৮)

বহিপীরের মাধ্যমে সমাজের পীরদের চতুর-অসৎ ধর্মাশ্রয়ী মানুষের রূপটিক প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। পীরের বিশ্বাস ও কথা বলার দক্ষতা তাকে নেতৃত্বের স্থানটা দিয়ে থাকে। পীরদের কপটতা, স্বার্থবোধ ও লালসা বহিপীরের সংলাপে প্রকাশিত—

> "আপনার মনে হইতে পারে যে-বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যও মিলিত হই নাই তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে কিন্তু তারা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা ফরজ হইয়া পড়ে। সময়ের স্বল্পতার কথা বলিয়া সে দায়িত্বের ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করা যায় না। এক মুহূর্তের স্ত্রীর প্রতি যেমন দায়িত্ব, দশ বছরের স্ত্রীর প্রতিও সমান দায়িত্ব।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৫৫)

নিজের বিবিকে ফিরে পাওয়ার জন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। নিজের মুরিদদের থেকে অর্থ নিয়ে হাতেম আলীর জমিদারী রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে কিন্তু এখানেও শর্ত জুড়ে দেয়— "আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৬৬) 'বহিপীর লালসালু'র মজিদের চরিত্রপ্যাটার্নের নবতর রূপায়ণ।' (আকরম; ২০১০: ৮০) আর তার পরাভবের মধ্যদিয়ে মূলবোধ আশ্রয়ী এ দেশের সমাজ কাঠামোর অন্তঃসারশূন্য চেতনা সংকেতায়িত হয়েছে। 'বহিপীরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গেলেও কিংবা নতুনের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটলেও - তাঁর সে নারী-লালসা-জনিত কার্যকলাপ, তা দেখে দর্শক বা পাঠক সমাজ হেসেছে, বিদ্রুপ করেছে-চোখের জল ফেলেনি কিংবা সহানুভূতি জানায়নি।' (জয়নুদ্দীন, ১৯৯০: ৪৯)

নাটকের শেষের দিকে হাশেম-তাহেরা বজরা ছেড়ে চলে যাওয়ার মাধ্যমে যে পরিবর্তনের সূচনা, নবতর মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সেটি বহিপীর মেনে নিয়েছে। তাদের বাঁধা দেয়নি বরং উচ্চারণ করেছে –

> "তাহারা গিয়াছে, যাক। তাছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল যাইবেই।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৭৩)

শেষ পর্যন্ত হাতেম আলীর জমিদারী রক্ষার অর্থের বন্দোবস্ত বহিপীর নিঃস্বার্থেই করেছেন। এভাবে নাট্যকার একজন পীরের মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক যুগ মানসকে প্রোথিত করে দিয়েছেন।

পীরদের প্রতি অন্ধ ভক্তি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, এক মুরিদের কন্যাকে জোর করে পীরের সাথে বিবাহ দেওয়ার মাধ্যমে। বৃদ্ধ পীরের আনুগত্য লাভ করার উপায় হিসেবে তরুণী মেয়ে তাহেরাকে পীরের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাহেরা এ বিয়ে মানতে না পেরে পালিয়ে যায় এবং একটি বজরায় আশ্রয় পায়। তাহেরা প্রাগ্রসর জীবনচেতনা এবং আধুনিক নারী ব্যক্তিত্বের আলোয় উদ্ভাসিত একটি উজ্জ্বল চরিত্র। আধুনিক নারীদের মতো সে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সে পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত কিন্তু পীরের সাথে যেতে রাজি না। সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেছে 'আমি কী বকরী ঈদের গরু ছাগল নাকি?' খোদেজার মুখ থেকে তার সাহসের কথাও উচ্চারিত হয়েছে। বহিপীরের প্রদর্শিত পুলিশ-ভীতিতেও সে ভীত নয়। বহিপীরের প্রতি তেজদীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন -

> "আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাবো না।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৫৮)

তাহেরা প্রতিবাদী হলেও মানবিকতা বর্জিত নয়। আশ্রয়দাতার প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল তাই হাতেম আলীর জমিদারী রক্ষার জন্য সে পীরের সাথেও যেতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তারও শর্ত রয়েছে -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাকে টাকাটা দিতে হবে, তারপর আমি যাবো।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৬৯)

তাহেরাকে দেখে *লালসালু* উপন্যাসের জমিলার কথা মনে পড়াটা স্বাভাবিক। যে সমাজের মাথাস্বরূপ মজিদের মুখে থুতু দিয়েছিল। তাহেরাও *বহিপীর* নাটকের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সমালোচকের উক্তিটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য —

> "পুরাতন, অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে লালসালু'র জমিলার যে-বিদ্রোহ তা পরোক্ষ, কিন্তু বহিপীরে তাহেরার যে-বিদ্রোহ তা প্রত্যক্ষ ও সরাসরি। *লালসালুতে* জমিলার অচৈতন্য পা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবেই মাজারের গায়ে লাগে, কিন্তু বহিপীরে তাহেরা ইচ্ছাকৃতভাবে পদাঘাত করেছে পীর মোল্লা কবলিত সনাতন সমাজকে, তাহেরার সচেতন পা এসে সশব্দে লাগে বহিপীরের শরীরে। এ বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ ও প্রচন্ড, এ বিদ্রোহ দুর্বিষহ।" (আবুল মকসুদ, ১৯৮১: ১৭৭)

হাতেম আলীর যুবক পুত্র হাশেম আলী কলেজের লেখাপড়া শেষ করে ছাপাখানার ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। শুরু থেকেই সে দায়িত্ববোধে সচকিত ও জাগ্রত। আধুনিক জীবনবোধে উজ্জীবিত হাশেম তাহেরা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেনি। মাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন - আমি তাঁকে বাঁচাবোই। তাঁকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাবো। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৬০)

হাশেম আলীর মানবিক সত্তার জাগরণ, দায়িত্ববোধ, নির্ভীক সত্তার উজ্জীবন শেষ পর্যন্ত উচ্চকিত থেকেছে। জমিদারী হারানোর ভয়, ছাপাখানা স্থাপনের স্বপ্ন অপসৃত হলেও কর্তব্য পালনের দায়ভার থেকে পালায়নি কখনো। হাশেম আলী তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরাধ্য প্রাণপুরুষ। নাটকের শেষ দিকে তার যে বিদ্রোহ সেটা যুগের বিদ্রোহ বলা যেতে পারে, পুরাতনকে ভেঙে নতুনকে নির্মাণের বিদ্রোহ ধ্বনির প্রকাশ বলেও ভাবা যেতে পারে।

হাতেম আলীর ঐতিহ্যসূত্রে রেশমপুরে জমিদারী ছিল কিন্তু সান্ধ্য আইনে পড়ে তা নিলামে উঠতে বসেছে। স্ত্রী খোদেজা ও পুত্র হাশেম বিচলিত হবে ভেবে সত্য তাদের থেকে গোপন করেছে। চিকিৎসার কথা বলে শহরে গিয়েছিল বন্ধু আনোয়ার উদ্দিনের থেকে অর্থ সাহায্য নিতে কিন্তু অর্থ সংস্থান করতে না পেরে সে সংকটে পতিত হয়। তাহেরাকে পীরের সাথে ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে বহিপীর অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তখন তার সামনে দুটি পথ থাকে। প্রথমত, তাহেরাকে ফেরত পাঠিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, তাহেরাকে বাঁচতে সাহায্য করে দুঃসহ বাস্তবতাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়টিকেই হাতেম নির্বাচন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যেও আধুনিক মানবিক সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। বহিপীরের প্রতি তার সংলাপ -

> "তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নাই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারবো না। যায় যাক জমিদারি।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৭১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ কৌশল ষাটের দশকে তো বটেই বর্তমান বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যেও প্রভাববিস্তারী স্থান দখল করে আছে। *বহিপীর* নাটকের চরিত্রগুলো এদেশে, এ ভূমির সন্তান হলেও মানবিকতা ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত রয়েছে পাশ্চাত্য আধুনিক জীবনভাবনার প্রভাব। 'তাঁর নিজের রুচি ও জীবনদর্শনে তাঁর পঠন-পাঠন ও সেই সূত্রে সৃষ্ট মননময় দুর্বলতার জন্য প্রকাশভঙ্গিমায় তিনি আধুনিক ইউরোপীয় লিখনশৈলীর অভিঘাতকে তার রচনায় স্থান দিয়েছেন।' (শফি, ২০১৪: ৩৯৬) ওয়ালীউল্লাহ্‌র পাশ্চাত্য প্রীতি ও আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় *বহিপীর* নাটকের আদ্যপ্রান্তে।

'তরঙ্গভঙ্গ' : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *তরঙ্গভঙ্গ* *বহিপীর* অপেক্ষা প্রাগ্রসর, শিল্পশুদ্ধ এবং ইউরোপীয় আধুনিক নাট্য আন্দোলনে পরিস্রুত। নাটকটি 'একটি বিচারকের কাহিনি' নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সংলাপ' এ প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯৬৮ সালে নাট্যকার *তরঙ্গভঙ্গ* নাম পাল্টে 'আমেনার বিচার' রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও প্রকাশকের পীড়াপীড়িতে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হয়েছে। যদিও 'আমেনার বিচার' নামটিই যথার্থ ও অধিকতর সার্থক হত বলেই মনে হয়। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর নাটক *তরঙ্গভঙ্গ* সম্পর্কে সমালোচক বলেন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বাংলাদেশের নাট্যভুবনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) অন্যতম পথিকৃত ব্যক্তিত্ব। তাঁর শিল্পীমানসে দেশজ জনজীবন-সংলগ্নতার-সঙ্গে পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নন্দনভাবনা ও দর্শনের নিবিড় সংশ্লেষণ ঘটেছে, যা সাহিত্যকর্মে বরাবর বিশিষ্ট মাত্রায় প্রতিবিম্বিত। তাঁর নাট্যচতুষ্টয়ের মধ্যে তরঙ্গভঙ্গ আধার ও আধেয়ের নিরিখে কালজয়ী সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত।" (তাশরিক, ২০২৩ : ৮৭)

তরঙ্গভঙ্গের বক্তব্য, প্রকাশভঙ্গি জটিল, মনস্তাত্ত্বিক সর্বোপরি উত্তর আধুনিক ভাবনায় পরিপূর্ণ। এতে জীবনের ও সমাজের মৌলিক সমস্যামূলের একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। আমেনাকে আশ্রয় করেই মূল সংকটটি বিস্তিত হয়েছে। আমেনা স্বামী ও সন্তানকে হত্যা করেছে। রোগে মরণাপন্ন স্বামীকে ঔষধ দিতে পারেনি। আবার স্বামীর কষ্টও সে সহ্য করতে পারেনি তাই ধুতুরার বিষ খাইয়ে স্বামীকে হত্যা করেছে। আবার সন্তানদের যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারেনি। ফলে কোলের শিশুটিকে সে মেরে ফেলেছে। স্বামী, সন্তান হত্যা করার অপরাধে আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর অভিযোগে বিচারকার্য শুরু হয়েছে। আদালতের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ঘটনাধারা নাটকটিতে সংযোজিত হয়েছে।

আমেনা চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে যে বৈষম্য রয়েছে সেটি দেখাতে চেয়েছেন। অনাহারী, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ কীভাবে একশ্রেণির স্বার্থবাদী ব্যক্তির দ্বারা জীবনে বিপর্যয়ে পড়ছে তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমেনা। ভিখারিণীর সংলাপে আমেনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "সেদিন দুপুর বেলা উঠানে বসে আমেনা, পাশে চার সন্তান ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে ক্ষিধেয়। সে গিয়েছিলো মিঞাদের বাড়িতে কাজের খোঁজে। কিন্তু মিঞাদের বাড়িতে কাজ নাই। আজও নাই কালও নাই। মিঞার বিবি নাকের সাথে ঝটকা দিয়ে বললো, না গো বেটি, তোমার কোলের এইটুকুন বাচ্চা কেঁদে কেঁদে জান খেয়ে ফেলবে, বড় ছেলে মেয়েগুলো ঘরে বাইরে ছুটোছুটি করে পাগল বানিয়ে দেবে।" (ওয়ালীউল্লাহ, ২০২২: ১২৫)

কাজের ইচ্ছে থাকলেও কাজ সে পায়নি। আমেনাকে সন্তান হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে মৌলবী আব্দুস সাত্তার নেওলাপুরী। সমাজের ভণ্ড মানুষের রূপটি তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ছোট ছেলেকে হত্যা করলে আমিনা দোজখে গেলেও সন্তান শান্তি পারে ভেবে সে সন্তান হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। সন্তান বাৎসল রূপ প্রকাশিত হতে দেখা যায়—

> "আমি দোজখের আগুনকে ভয় করিনা। আমার বাচ্চার দুঃখ-কষ্ট যদি শেষ হয় আমি দশ দোজখে যেতে রাজী।" (ওয়ালীউল্লাহ, ২০২২: ১২৫—১২৬)

সন্তান হত্যার মতো নির্মম কাজ করলেও এর মূলে ছিল তাদের যন্ত্রণা লাগব করা। আমেনার সন্তানদের কষ্ট নাশের জন্য হত্যা ও নিজে দোজখে যাবার ভয় না করার মানসিকতায় বাঙালি মায়ের সন্তানদের কষ্ট সহ্য করতে না পারার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

আমেনাকে নিষ্ঠুর পাষাণ মনে হলেও সে জীবনবাদী, সন্তান-বৎসল এক নারী। তার মধ্যে যে নিষ্ঠুর রূপটি দেখা গেছে সেজন্য দায়ী আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। মিঞার বিবি কাজ দিলে কিংবা নেওলাপুরী কুমন্ত্রণা না দিলে হয়তো আমেনা জঘন্যতম কাজে প্রবৃত্ত হত না। নাটকটিতে আমেনার কথাগুলো ভিখারিণীর মুখে উচ্চারিত। স্বামী-সন্তান হত্যার পরও কোনো অনুশোচনা তার মধ্যে নেই বরং সে তাদের দুঃখের অবসান করতে পেরেছে বলে স্বস্তি পাচ্ছে। পীড়াহীন আধুনিক মানুষের রূপটি তার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাই ভিখারিণী বলেন—

> "পাপ-পুণ্যের কথা নিয়ে আমেনা মাথা ঘামায় না। কার সাহস পাপ-পুণ্যের কথা তোলে তার সামনে? কার সাহস তাকে জিজ্ঞেস করে কেন সে তার স্বামীকে বিষ দিয়েছে, কেন তার সন্তানের জান নিয়েছে?" (ওয়ালীউল্লাহ, ২০২২: ১৩৮)

নাটকের শেষের দিকে জনতার প্রহারে আমেনার মৃত্যু হয়, এর মধ্য দিয়ে সেও স্বামী-সন্তানের মতো চির শান্তির পথেই অগ্রসর হয়েছে। আমেনার মৃত্যু প্রসঙ্গে নাটকে বর্ণিত—

> "জজসাহেব, সর্বনাশ হয়ে গেছে। যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সে আর বেঁচে নেই। ...রক্তপাগল জনতার আর্তনাদ শুনছেন? আমেনাকে খুন করেও তাদের তৃপ্তি হয় নাই।" (ওয়ালীউল্লাহ, ২০২২: ১৪৯)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জজ সাহেব আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপটি ধরতে পেরেছেন। তাই আমেনার স্বামী-সন্তান হত্যার চেয়ে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন আমেনা হত্যাকাণ্ড ঘটালো? তার বিবেচনায় আমেনা অপরাধী হলেও প্রকৃত অপরাধী আসলে আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থা। নেওলাপুরীকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এভাবেই অসত্যের কাছে সত্যের মৃত্যু ঘটেছে। জজের এ মৃত্যুকে বিবেকের মৃত্যু বলেও মনে করা যেতে পারে।

মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর মাধ্যমে সমাজের স্বার্থবাদী, ধর্মের মুখোশধারী মানুষের রূপাঙ্কন করেছেন। 'আবদুস সাত্তার *লালসালু*'র মজিদ এবং বহিপীরের বহিপীর চরিত্রের উত্তরসূরী। কিন্তু এখানে সে মজিদ ও বহিপীরের চেয়ে আরো সাহসী-আরো অগ্রসর।' (জয়নুদ্দীন, ১৯৯০: ৭০) মজিদের মতো সে-ও কৌশলী। কথার মাধ্যমে সহজেই অন্যকে বশ করতে পারে, সেই সাথে ধর্মের বুলি আওড়াতে থাকে—

> "দিন দুনিয়ায় আমার খেয়াল নাই খোদার কাজেই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সমাজের মধ্য থেকে যখন, কর্তব্যের ডাক আসে তখন তা অবহেলা করতে পারি না।" (ওয়ালীউল্লাহ, ২০২২: ১১৪)

নেওলাপুরী উকিলদের বশ করে নিয়েছে অর্থ দিয়ে। ফলে সকলে জজের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। আর এর মধ্য দিয়েই সমাজমূলের ভণ্ড লোকদের মনোভাব প্রকাশিত হয়। কালে কালে নেওলাপুরীর মতো ধূর্ত ব্যক্তিরা সমাজ ও জনগণের দোহাই দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। সমালোচক তাই বলেন—

> "নাট্যকার মৌলবী আবদুস সাত্তারের নামের শেষাংশে নেওলাপুরী যোগ করেছেন এই অর্থে যে তার গ্রামের নাম নেওলাপুর। কিন্তু 'নওল' শব্দটি অপর একটি পরিচিত বাংলা শব্দের কথা মনে করিয়ে দেয় - 'বেজী' নামক একটি অতিশয় ধূর্ত প্রাণীকে নির্দেশ করে। মৌলবী আবদুস সাত্তার যেন সেই 'নেওলী' রূপী প্রবঞ্চনা, শঠতা, ধূর্ততা।" (জয়নুদ্দীন, ১৯৯০: ৭১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ইতিবাচক রূপান্তর দেখাতে প্রয়াসী। বহিপীরের মধ্যে যেমন মানবিকতার আরোপ করেছিলেন তেমনি নেওলাপুরীর মধ্যেও পাপবোধ জাগ্রত হতে দেখা যায়। যার কারণে সে আর আমেনার ফাঁসি কামনা করেন নি। ভিখারিণীর মাধ্যমে কোরাস চরিত্রের দিকটি প্রকাশিত। ইউরোপীয় নাটকে কোরাসের ভূমিকা অনেক যদিও প্রাচ্য নাট্যে কোরাস ততটা গুরুত্ব পায় না। সমাজের শঠ ও স্বার্থবাদীদের সে শনাক্ত করতে পেরেছে। মতলুব আলীর মাধ্যমে নাট্যকার দেখিয়েছেন সময় ও পরিবেশের চাপে পড়ে মানুষ কীভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

সাহিত্যচিন্তায় ইউরোপমনস্ক ওয়ালীউল্লাহ্ *তরঙ্গভঙ্গে* অ্যাবসার্ডের অবতারণা করেছেন। অসঙ্গত, অযৌক্তিক বিষয় অ্যাবসার্ডের অন্যতম দিক। জজ সাহেবের মৃত্যুর পর আবার বিচারের রায় লিখছেন এটা কোনভাবেই বোধগম্য হয় না। চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। মনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবনার মাধ্যমে চরিত্রের চেতনাপ্রবাহ উঠে আসতেও দেখা যায়।

> "বিষয় কিংবা আঙ্গিক দুই দিক থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *তরঙ্গভঙ্গ* পালাবদলকারী সাহিত্য নির্মাণ।" (রামেন্দু, ১৯৭৫ : ২৪৫)

নাটকটিতে সমাজের ধূর্তদের কাছে সত্যের, সচেতন বিবেকের পরাজয় হলেও শেষে প্রতীকধর্মী সংলাপের অবতারণা করে সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক সেটি প্রকাশ করেছেন।

'উজানে মৃত্যু' : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সবশেষ নাট্যকীর্তি *উজানে মৃত্যু*। এর ইংরেজি নাম ডেথ আপ স্ট্রিম। তৎকালীন 'সমকাল' পত্রিকায় এই একাঙ্কিকাটি প্রকাশিত হয়। *বহিপীর* ও *তরঙ্গভঙ্গে* নাট্যকারের যে তীব্র সমাজ সচেতনতা লক্ষ করা যায় *উজানে মৃত্যু* নাটকে সেখানে সমাজের চেয়ে ব্যক্তি মনের প্রগাঢ় অনুভূতি অ্যাবসার্ডের ফর্মে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। *উজানে মৃত্যু*-তে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের অবতারণা নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক। *'উজানের মৃত্যু* বাংলা ভাষার প্রথম অ্যাবসার্ড নাটক' (মকসুদ, ১৯৮১: ৩৭২)। রূপক ও প্রতীকের মেধাবী প্রয়োগে নাটকটি উজ্জ্বল নাট্যনির্মাণ হিসেবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিবেচিত। সমালোচক মনে করেন-'*বহিপীর*-এর মাধ্যমে যে নাট্যযাত্রার সূচনা *তরঙ্গভঙ্গ*-*সুড়ঙ্গ*-এর মোহনা পেরিয়ে *উজানে মৃত্যুতে* এসে তা হয়েছে বিশ্বপ্রসারী, সমুদ্রসমর্পিত।' (জীনাত, ২০০১: ১৮৪)।

"*উজানে মৃত্যু* এক বিপন্ন মানব-চৈতন্যের শূন্যতাবোধ, শুভবোধশূন্য অন্তরানুভূতির রূপায়ণ। এটি গল্পহীনদের গল্প, ঘটনাহীনদের বিচূর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের সমাহার।" (জীনাত, ২০০১: ১৮৪)। নাটকটিতে অন্তরবাস্তবতা (Inner reality) ও অভিব্যক্তিবাদী চেতনার সার্থক প্রকাশ চোখে পড়ার মতো।

উজানে মৃত্যুতে উত্তর আধুনিক নাট্যরীতির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। নৌকাবাহক একজন মানুষ (being) এর প্রকাশক। সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি আমাদের চৈতন্যের প্রজ্ঞাময় সত্তা, তথা শুদ্ধতার প্রতীক, কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি আমাদের শরীরের দৈব সত্তা তথা বীভৎসতার প্রতীক, নৌকা আমাদের জীবন, নদী চলমানতার প্রতীকে প্রকাশিত। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাই বলেছেন, 'উজানের মৃত্যু প্রতীকী নাটক।' (মান্নান, ২০০১: ১৪২)

নাটকটিতে নৌকাবাহক জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত। নানারকম অসুখ ও দুর্যোগে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের হারিয়েছে। অর্ধেক জমি তাকে হারাতে হয়েছে বাকি জমি পানিতে নিমজ্জিত - ফলে সবকিছু হারিয়ে সে নিরন্তন ছুঁটে চলেছে। বালি হাঁসের মতো কোথাও যেতে চায়—

> "কোথাও না-কোথাও যেতেই হয়। এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে আর উপায় থাকে না।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৭৯)

এই যেতে চাওয়া হল মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। যে মৃত্যু কষ্টকর উজানের পথে আসে। ফলে এই মৃত্যুই হয়ে দাঁড়িয়েছে *উজানে মৃত্যু*।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি শুদ্ধ সত্তার রূপ হিসেবে নৌকাবাহককে নিয়ে তার ভাবনা। সে বারবার নৌকাবাহকে কষ্টকর যাত্রা থেকে অব্যহতি নিতে বলে কেননা যাত্রাটাকে তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি জীবনকে ভালোবাসে, মরতে চায় না। অপরদিকে, কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নিরন্তর চলার কথা বলে, সে চলার মাধ্যমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার দিকটি প্রকাশিত। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির প্রশ্ন-কেন নৌকাবাহক ঘরে থাকেননি এবং কেন সে নতুন বউ ঘরে আনেননি। নৌকাবাহকের তখনকার সংলাপে উত্তর আধুনিকদের মতো পুনরাবৃত্তি না করার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে—

> "অবশ্য ঘরে থাকতে পারতাম। শান্তশিষ্ট একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করতে পারতাম। তারপর অনেক ছেলে মেয়ে হতো, কিন্তু ওসব কিছু করিনি। তাতে কেবল পুনরাবৃত্তি হতো, এবং পুনরাবৃত্তির মত জিনিস আর কিছুই নাই।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০২২: ৮৭-৮৮)

নাটকটিতে অ্যাবসার্ড রীতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'আবসার্ড শব্দটির অর্থ সামঞ্জস্যবিহীন (out of harmony) এর আভিধানিক অর্থ হল যুক্তি বা সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন, বেমানান, অসঙ্গত, অযৌক্তিক।' (কুন্তল, ২০১১: ১৩)। অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্রগুলোকে শূন্যতা গ্রাস করে নেয় যাকে বলা হয় 'Metaphysical emptiness'. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড রীতির প্রতি অণুরক্ত হলেও ঐকান্তিক নিষ্ঠ ছিলেন না। ইউরোপীয় রীতির সাথে স্বদেশের সমাজকাঠামোকে সমন্বয় সাধন, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে *উজানে মৃত্যুর* অ্যাবসার্ডের জগতটি। নৌকাবাহকের বর্ণনায় একজন লোকের তিনদিন তিন রাত বাঁশবিদ্ধ হয়ে থাকার পর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে সেখানে অ্যাবসার্ডের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। তাছাড়াও কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমে একটি মেয়েকে জলন্ত শিক দিয়ে দগ্ধ করার বর্ণনার মধ্যে অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা দেখা যায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *উজানে মৃত্যু* সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এক সাক্ষাৎকারে মতাজউদদীনকে জানান আশা উচ্চ থাকলেও প্রত্যাশিত সাড়া তিনি পাননি। ওয়ালীউল্লাহ্ বলেছেন—

> "উজানে মৃত্যু নাটকটি ইতালীয় এবং ফরাসী রূপ সে সব দেশের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে জানলুম এ নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়া দূরে থাক অনেকেই পড়েও দেখেননি। আর পড়লেও মনোযোগ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 45
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 385 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> দিয়ে অনুধারন করতে চাননি। আমার ইচ্ছা ছিল ওই ফর্মে আরো আটটি নাটিকা লিখে পাঠাবো।" (রামেন্দু, ১৯৭৫: ২৪৫)

আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যরীতির জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে নাট্যকার নাটকটিতে স্থান দিয়েছেন। মানুষের যে গন্তব্যহীন যাত্রা সেটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো এক দিনের ঘটনা নাটকটিতে বর্ণিত হয়েছে। শূন্য নদীর সাথে শূন্য জীবনকে তুলে আনা হয়েছে। এভাবে এ দেশের পটভূমিতে ওয়ালীউল্লাহ্ পাশ্চাত্য কাঠামোয় নাটক নির্মাণ করলেন। তবে তা কাঠামো প্রথাগত অনুকরণ নয়, বরং নাট্যকারের উপস্থাপন কৌশলে তা শিল্পগৌরব পূর্ণ ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *উজানে মৃত্যু* বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জটিল ও দুর্বোধ্য রীতিতে নাটকটি গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় শিল্পরীতির সংযোজন ঘটিয়ে নৌকাবাহকের মাধ্যমে জীবনের অর্থহীনতার রূপটিকে প্রকাশ করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *বহিপীর*, *তরঙ্গভঙ্গ* ও *উজানে মৃত্যু* নাটক তিনটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে মানবিক অস্তিত্ব ও সমাজবাস্তবতার গভীর ও বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব ও স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত এক সচেতন মানুষ। *বহিপীর* এ ধর্মীয় গোঁড়ামি, ক্ষমতার অপব্যবহার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানবিক বিবেকের উপস্থিতি, *তরঙ্গভঙ্গে* ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব ও জীবনবাস্তবতার সংঘাত এবং *উজানে মৃত্যুতে* প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রামের দিকটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। ফলে নাটকগুলো নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে কালোত্তীর্ণ শিল্প নির্মাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রাজ্ঞসর দৃষ্টিভঙ্গি নাট্যসৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর নাটকে মানবিক অস্তিত্ব ও সমাজবাস্তবতার সমন্বিত রূপ বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পসাফল্যের অন্যতম প্রধান পরিচায়ক।

Bibliography:

আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০১
কুন্তল মিত্র, *অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়*, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১
জীনাত ইমতিয়াজ আলী, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১
তাশরিক-ই-হাবিব, *তরঙ্গভঙ্গ: সংলাপ সংগঠন বিবেচনা*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, জন্মশতবর্ষ, স্মারকগ্রন্থ, ২০২২ পরান কথা, ঢাকা, ২০২৩
নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা,১৯৭২
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৪
মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯০
রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত) *থিয়েটার*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৫
শফি আহমেদ, *ফিরে দেখা: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, নান্দীপাঠ, সংখ্যা ৬, ঢাকা, ২০১৪
সৈয়দ আকরম হোসেন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮
সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য*, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা, ১৯৮১
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *নাটক সমগ্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, কথাশিল্প প্রকাশন, ঢাকা, ২০২২